পাপের মূর্তিগুলি উঠে আসে

অজিত কুমার দত্ত

যোগেন চৌধুরীর কিশোর বয়সটাই অন্যরকম। কিংবা আরও পরে, কৈশোরান্তিক ভাবনাও কম স্বপ্নমেদুর নয়। পৃথিবীটা মনে হয় আলো ঝল্‌মল্। স্কেচ্‌বুক হাতে জনাকয়েক তরুণ শিক্ষার্থী শিল্পীদলকে পুকুরপাড়ে বা খালের ধারে ছবি আঁকতে দেখলে, কিশোরেরও উঁকি ঝুঁকি মারতে সাধ হয়। ভাবে মনে মনে কি মজা ওদের। কত রঙিন ছবি এখন ওরা ফুটিয়ে তুলবে ইচ্ছামতো। ছবি সে ভালবাসে। মাটির তাল দিয়ে খেলা বা আঁকিবুঁকি লালনীল পেন্সিলে নিজেও করেছে একসময়। ভাল ছবির প্রতিলিপি গুছিয়ে তুলে রেখেছে কখনও। এদিকে সাহিত্যপ্রীতি ও সবান্ধব কাব্য-নাটক-চর্চার দৌলতে আরেক আকাশ অবারিত। রোমান্টিক মন আর কাব্যিক কলমে অন্য প্রকাশ—'শত আয়নায় ভাঙা মুখখানি জুড়ে/স্নায়ুতে আমার—করুণা ঘনায় সহসা—/ তুমি, ফেরাবে না মুখ—/ ক্ষত ছেয়ে গেছে—করুণা, কোমল কণ্ঠে/ এখানে অমল অজস্র শ্বেত মুখ।' এরকম আরও অনেক পঙ্‌ক্তি। ছবি আর কবিতা দুই সমান্তরাল প্রবাহ যেন ছুঁয়ে গেছে জীবনকে দুদিকে এসে। আবার এক জগৎ থেকে অন্য জগতে পার্থক্য দেখা গেছে মানসিকতায়। কবিতার রোমান্টিকতা ছবিতে পর্যবসিত হয়েছে আশ্লেষ এবং হয়ত বা বিক্ষুব্ধতায়। শেষ পর্যন্ত যেন চিত্রশিল্পীই সোচ্চার।

যোগেন চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৯) পুব বাংলার ফরিদপুরের সজল শ্যামল অঞ্চলে জীবনের প্রথম কয়েক বছর কাটালেও, দেশবিভাগের পর এপারে চলে আসার ফলে, একরকম কলকাতারই নাগরিক। শহরের উপান্তে গড়ে-ওঠা কলোনীতে সে জীবনের শুরু। বাঁচার তাগিদের, জীবনসংগ্রামের সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। অকস্মাৎ-ই একটা স্নপ্নভঙ্গ। সেখানে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে আপোষরফা নিতান্তই কঠিন কল্পনা। ছবি আঁকিয়ে হবার ইচ্ছা থাকলেও, হওয়া কতটা সম্ভব সে নিয়ে মস্ত সংশয় ছিল। সমস্যা ছিল অর্থ সঙ্গতির। কারণ পরিবারের যথাযথ পুনর্বাসন তখনও হয়নি। পারিবারিক এক হিতৈষীর প্রাথমিক চেষ্টায় এবং প্রবেশপরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হওয়ায় সীট্ হল এবং স্টাইপেন্ড পেয়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক সমস্যারও মোটামুটি সমাধান হল। গোড়ায় মডেলিং-এর ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেও, হাত ভাল থাকায় ও ক্লাসপরীক্ষায় ফল আশানুযায়ী হওয়ায়, গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ তার ফাইন আর্টসে ট্রান্সফারে রাজী হয়েছিলেন। ছাত্রও তাঁদের নিরাশ করেনি, সর্ব্বোচ্য সম্মানের সঙ্গেই শেষ পরীক্ষায় সে উর্ত্তীর্ণ হয়েছিল।

হয়ত বা একটা সহজাত অন্তরঙ্গতার কারণে পরিশ্রমে পেছপা সে ছিল না এবং কাজেও আনন্দ পেত। কোনও বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষককূলের আলাদা প্রভাব ছাত্রজীবন অথবা অব্যবহিত পরের সময়টা না থাকলেও কাজে ভাটা পড়েনি। স্নাতকোত্তর পর্বে হাওড়া জেলা স্কুলে কর্মসংস্থান হওয়ার পরেও কজন বন্ধু মিলে নিয়মিত এবং বড় আকারে ড্রইং করেছে। ওরা হাওড়া এবং শেয়ালদা স্টেশনেই যেত অধিকাংশ সময়ে। জীবনের ভগ্নদশার সঙ্গে সে এক মুখোমুখি পরিচয়। ছবিতে বর্ণাবলেপও তাই বহুক্ষেত্রে ধূসর, ম্লান। কেশপরিচর্যা, মা ও ছেলে, জনাকয়েককে নিয়ে গ্রুপ বা কল্পিত পরিবার ইত্যাকার রূপবন্ধে পরিচিত জন এবং অবয়বী চিন্তারই রেশ। উইভার্স সার্ভিস সেন্টারে যোগদান ও পরে বৃত্তি লাভান্তে প্যারীস গমন পর্যন্ত কাজে এই বিশেষ চিন্তা বা ছাপ খুব স্পষ্ট।

কলেজ পাঠ সম্পন্ন করার স্বল্পকালের মধ্যে দুবছরের মেয়াদে ফরাসী দেশে অবস্থান শিল্পীর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যুরাল বা ভিত্তিচিত্র এবং ছাপাই ছবি শেখার ব্যাপারটা থাকলেও, দেখব, জানব, বুঝব আর সাধ্যমত নিজেই এগুব—এই যেন ছিল আসল মনোভাব। শেষ অবধি খানিকটা পিকাসো-প্রভাবসত্ত্বেও শিল্পীকে আপন কক্ষপথে ফিরে আসতে দেখা যায়। এক সময় ছবিতে জ্যামিতিক বা বিমূর্ততার চিহ্ন খানিকটা নজরে এলেও, ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই সাময়িক। দূর প্রবাসে থাকার কারণেই হয়ত বা ফেলে -আসা দিন, বিশেষত শৈশবের শান্ত, নিস্তরঙ্গ দিনগুলো ক্রমে মনে ভিড় করতে শুরু করে। চেনা-জানা পদ্ম-শালুক, ফুল-লতা, প্রজাপতি-ফড়িং ঘিরে পরিকল্পনা আরম্ভ হয় স্বপ্ন

সিরিজের। বিদেশবাস, বিশেষ শিল্পনগরী প্যারীতে সময়াতিবাহিত হওয়ায় য়ুরোপীয় শিল্পের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের ফলে, শিল্পীর মনে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন সেই সঙ্গে দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রশ্নের উদয় হয় তুলনামূলক বিচারে আজকের ভারতশিল্পের যথার্থতা সম্পর্কে। মনে মনে বিচারের চেষ্টা চলে। শিল্পীর সে সময়কার ডায়েরী বা তৎভিত্তিক লেখা এই মননেরই ফলশ্রুতি। বোঝা যায় প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিজেই সে তখন অস্থির। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরে এক সময় এই ভাবনা পত্রস্থও হয়েছে। আরও বড় কথা, এই শিল্প-চিন্তা শিল্পীর ক্রমিক পদক্ষেপ বা বিবর্তনেরও যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

২

বিদেশবাস দীর্ঘায়িত হবার সম্ভাবনা এক সময় থাকলেও, পারিবারিক কারণে নির্দিষ্ট সময়ের শেষে শিল্পীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ফিরে আবার সেই উইভার্স সার্ভিস সেন্টারে যোগদান। কিছুকাল কলকাতায় কাটানোর পর বদলি হয়ে চলে যেতে হয় মাদ্রাজে। দেশে ফেরার পরেকার পর্বে শিল্পীর কাজে কতগুলো বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। একদিকে যেমন স্বপ্নিল মন খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি সময় সময় বয়ন-বুনন-তন্তুজের বাতাবরণও মেলে। একটু বিশদ করা যেতে পারে কথাটা। সেই হারানো দিনের পদ্ম-গোলাপ বা পরিপাটি সূচীকর্মে সজ্জিত রঙিন সূতোর "ভালবাসা" বা "ফুলশয্যা"র দেখা যেমন মেলে কিছু ছবির পরিকল্পনায়, আবার কিছু ছবিতে তাঁত-মাকু অথবা হাওয়ায় দোলা ফিনফিনে কাপড়ই দৃষ্টিগ্রাহ্য। বক্তব্য যাই হোক, কল্পনা বা রোমান্টিক মন বিশেষভাবে প্রকাশিত এই সব কাজে। আবার স্বপ্নও সর্বদা সুখস্বপ্ন নয়। নিস্পিষ্ট অবচেতন থেকে সময় সময় বেড়িয়ে আসে সাপ, পোকা-মাকড়। নিরন্তর লড়াই, নাকি যন্ত্রণাজর্জর জীবনেরই ছায়াপাত? বক্তব্য বা উপস্থাপনাই কেবল নয় প্রকাশেও বহু কাজই বিশিষ্ট। বর্ণাবলেপ সীমিত, কিন্তু উজ্জ্বলতর। রেখার মুন্‌শীয়ানাও যথেষ্ট। বলা চলে, চর্চা, কুশলতা ও অভিজ্ঞতার যৌথ বিন্যাস।

এই কুশল কারিগরি, বিশেষত রেখাঙ্কনের দরুণ সম্ভব হয়েছে সহজ উত্তরণ। বেগ পেতে হয়নি পর্বান্তরে পৌঁছুতে। উল্লেখ করা যেতে পারে গনেশ-উপজীব্য কিছু কাজ। গনেশের দেব-মহিমা, সিদ্ধিদাতা-পরিচয় তখন অন্তর্হিত। বরং বলা চলে যেন উল্টানো গনেশই অতি সহজে আকৃষ্ট করেছে শিল্পীকে। নানা ভাঙচুর, নানা খেলা শুঁড় পা মাথাটা নিয়ে। সবই মনে হয় রঙ্গ-তামাশা বা বিদ্রূপ। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং চিন্তারই পরিণাম যেন। সব যে এক ধরণের শ্লেষাত্মক প্রকাশ সেটা বুঝতে খুব কষ্ট হয়না। ভিন্ন প্রত্যয় আর বলিষ্ঠতার সঙ্গেও পরিচয় ঘটে 'দ্য ভিক্টেরিয়াস ম্যানে'র মতো কাজে। গাঢ় বর্ণের পৃষ্ঠপটে কালো আঁচড়ে আর হাল্কা গোলাপীতে একটি মুখ। পাশ থেকে আঁকা (প্রোফাইল) ধরণের হলেও, আত্মবিশ্বাস বা বলিষ্ঠ ছাপ কাজটি জুড়ে।

কাছাকাছি সময়ে সত্যনিষ্ঠ কবির সঙ্গেই পাল্লা দিচ্ছে শিল্পীর মুক্তদৃষ্টি। আলোকজ্জ্বল প্যারী সাময়িক আকর্ষণ করলেও, স্বজন স্বদেশ হোক না মলিন বা নিস্প্রভ, সমভাবেই সত্য, বেশি উৎকট রকমে সত্য এবং উপস্থিত। তাই উদাসীন বা গজদন্ত মিনারবাসী হওয়া আর সম্ভব নয়। কবির কলমে যদি বা আসে—'যতদূর স্বপ্ন দেখা যায় জানালায়—/ হাওয়ায় আসছে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে নুন/বুকের বেদনায় এসে মেলে; আছড়ায়/ ।' কিন্তু শিল্পী সেই আবেশ বিহ্বলতা কাটিয়ে আরও অগ্রসর। দৃষ্টি আরও তির্যক। আরও অগ্নিগর্ভ। কবির চেয়ে চিত্রশিল্পী, দেখা যায়, তাই প্রধান শেষ অবধি।

বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে এই পর্যায়ের শুরু বা আদি প্রচেষ্টা রোমান্টিকতা আশ্রিত। চিন্তা ক্রমে এগিয়ে গেছে, যাবেই। সেই পরিণত চিন্তাতেই মিলেছে একের মধ্যে বহুর সমন্বয়। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর 'সুন্দরী' এবং 'নটী বিনোদিনী' ছবি দুটির কথা বলা যেতে পারে। প্রথমটি মুখ্যত ড্রইং, একটি রেখাশ্রয়ী কাজ। নিরাবরণ-বক্ষ একটি মহিলার মুখচ্ছবি সেটি। কাজের রোমাঞ্চ বা চেহারার আকর্ষণ সত্ত্বেও, নীতিবোধ বা রুচি নিশ্চয়ই ধাক্কা খাবে গোড়ায়। দ্বিতীয় ছবিটিতে একটি মহিলার চেহারা পরিস্ফুট। শাড়ি ব্লাউজে পুরানো ঢঙ, অলঙ্কার এবং ফুলশোভায়ও সেই প্রাচীনত্ব। শাড়ী-ব্লাউজ সত্ত্বেও বক্ষ এক্ষেত্রেও আবরিত নয়। প্রতিকৃতি যথার্থই সুপরিচিত নটীর কি না সেকথাও অবান্তর। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যেন শিল্পীরই তরফে— সমাজ কি সত্যি এদের এভাবে দেখতে চায়নি? গৃহ বনিতার সম্মান কি দিয়েছে? কাচ হাতে নিয়ে হীরে খুঁজতে

বসার মতো একটি মারাত্মক অথবা জটিল মানসিকতা! পুরনো কলকাতা, বাবু কালচার বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ এবং বহু কিছু চেপে ঢেকে রাখার প্রয়াস— এরকম একাধারে অনেক কথাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে মনে হয়। একই অঙ্গে এত রূপের মতোই ছবি দেখতে দেখতে প্রাচীন বা কালীঘাটের পট বিদ্যাসুন্দর আর বেলফুল একই সঙ্গে ধাক্কা মারে স্মৃতির দুয়ারে। দৃষ্টি গ্রাহ্যের সঙ্গে স্মৃতি গ্রাহ্যের সমন্বয় ঘটে। দেখার সঙ্গে ভাবনাও আসে। নীতিবোধ ধাক্কা খেলেও প্রশ্ন জাগে মনে। শিল্পীর উদ্দেশ্যও তাই। চেষ্টা অবশ্যই সার্থক।

৩

শিল্পী যোগেন চৌধুরীরও আর পাঁচজনের মতোই বিরামহীন অন্বেষণ। সেই প্রয়াসে সুন্দরী এবং 'নটী' বিশেষ দিকচিহ্ন, পথের এক নতুন বাঁক। কারণ, এই পর্যায়ে পৌঁছে কেবল আত্মবিশ্বাসই নয়, সমনুষ্যমূর্তি বা অবয়বী ছবির সংকল্পও দৃঢ় হল। তাই দেখি মুখ, মুখাবয়ব টরসো বা চরিত্রচিত্রণের ক্রমবিস্তৃতি। অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থের প্রোফাইলের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবীকে। সুট্, টাই, চশমা-পরা এক ক্লান্ত মানুষ। ক্লান্তির চেয়ে হতবুদ্ধি আর নৈরাশ্য ভাবটাই বেশী চেহারায়। রয়েছে সোফায়-বসা একজন। পাদভূমি বা প্রেক্ষাপটের তেমন কোনই গুরুত্ব নেই, যেন নিস্প্রয়োজন। মুখ্যত প্রোট্রেট গ্যালারী, তাই অসংখ্য চরিত্রের মেলা। রঙ কখনই সবিশেষ গুরুত্ব পায়নি, এ পর্যায়েও নয়। কিন্তু রেখার মর্যাদা বা ভূমিকা বেড়ে গেল। রেখা আউটলাইন বা ফর্ম ফুটিয়ে তোলারই সহায়ক হল না, প্রয়োজন অনুযায়ী পাদপূরণেও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। মূলত, ছবি কেবল ইলাস্ট্রেশন নয়, তাতে চরিত্র আরোপের চেষ্টা বিশেষভাবে নজরে পড়ল। সোফায়-বসা সেই লোকটির উর্ধ্বাঙ্গে পরিধেয় প্রায় কিছু নেই, কিন্তু কোচ-সোফা বা বিশেষ বর্ণলেপে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সে নব্য ধনী। শিক্ষা বা রুচির পালিশ পড়েনি। প্রকাশের মুন্‌শীয়ানায় কাজটি তাই প্রাথমিক বক্তব্য ছাড়িয়ে অন্য কিছুও যেন বলে। এরকমই বক্রদৃষ্টি বা ঈষৎ শ্লেষ খুঁজে পাওয়া যাবে পাঞ্জাবী-ধুতি বা সেরকমই শোভিত আরেকটি উপবিষ্ট চরিত্রে। মাথায় একটি টুপি, মাথার তুলনায় খুবই ছোট, বেমানান। যেন বলা সব দুর্বুদ্ধি ঢাকা পড়েনি এটুকু টুপিতে। দর্শকও স্বীকার করে যে সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক বা তেমনই কেউকেটা আমাদের আশেপাশেরই লোক, খুবই পরিচিত। আকারে বড় নয়, প্রায়শ ছোট কিন্তু চিন্তায়, প্রকাশে কাজগুলো পরিণত; ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেবার এক শিল্পগুণান্বিত প্রচেষ্টা। প্রোপাগাণ্ডা—ক্যারিকেচারের চেয়েও বেশী কিছু। সার্থক এসব চেষ্টা আরেক কারণে। শিল্পী এক্ষেত্রে চরিত্র বা রূপবন্ধে দুর্লভ এক ভারতীয়তা আরোপে সক্ষম হয়েছে। হাঁটা, চলা, বসা কিংবা হাত-পা-মুখের ভঙ্গীতে ভারতীয় আবহাওয়া সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে এদেশীয় সমকালীন বহু শিল্পীর কাজই মনুষ্যমূর্তি-ভিত্তিক। সেসব কাজে কোথাও বা ফ্রান্সিস বেকনকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কেউ বা কিউবিজমের পথে জ্যামিতিক রেখায় ব্যক্ত করেছে মানুষ। কিন্তু সেসব সৃষ্ট চরিত্রের ভারতীয়ত্ব কতখানি তা বলা শক্ত। অনেকক্ষেত্রেই মনে হয় প্যান্ট ছাড়িয়ে ধুতি-পাজামা পরানোর ব্যাপার। সেই অর্থে আমাদের শিল্পীর রূপারোপ প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে নিশ্চয়ই।

শিল্পীর চিন্তা বা মানসিকতার সঙ্গে সাম্প্রতিক পর্যায়ের উপরোক্ত কাজগুলির একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়। দেশ বিভাগ জনিত বিরাট বিপর্যয়ের আবাল্য সাক্ষী আমাদের শিল্পী। আশা-নিরাশায় দোলা বা স্বপ্নভঙ্গে সব শেষ হয় নি এক্ষেত্রে। শিল্পীর কলকাতা থেকে প্যারী অথবা ঢাকুরিয়া থেকে নয়াদিল্লীর পথপাড়ির (বর্তমানে রাষ্ট্রপতিভবনের শিল্পসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত আরক্ষক।) ফলে অনেক স্বপ্ন হয়ত সার্থকও হয়েছে। তার শিল্পকৃতির সমাদর হয়েছে, দেশে নানা প্রদর্শনী এবং শিল্পীশিবিরে যোগদান ছাড়াও, আন্তর্জাতিক বহু আসরেও আমন্ত্রণ মিলেছে (উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে ফ্রান্সে কাগনে সু-মে-তে অংশগ্রহণ ও গমন)। কিন্তু ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়ে যে পারিপার্শ্বিক বহুসময়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শ্বাসরোধকারী সমাজজীবনের দৈনন্দিন গ্লানি, তিক্ততা আর ভ্রষ্টাচার, তা শেষ হয়ে যায়নি। বেড়েই চলেছে, জমে জমে পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে। এই চেহারাটা বারবার এসে হানা দেয়, উঁকি মারে থেকে থেকে, মননে চিন্তায়। অস্ট্রিচের মতো চোখ ঢেকে সমস্যা এড়িয়ে যেতে নারাজ বলেই নানাভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে রূপ পরিগ্রহ করছে সব কলমে-তুলিতে। লেখনীতে পাই—'পাপের মূর্তিগুলি

উঠে আসে। প্রপিতামহের মুখগুলি অবিকল চেনা যায়, অকস্মাৎ' (হৃদয় ট্রেন-বেজে ওঠে কাব্যসংকলন দ্রষ্টব্য)।

ছবিতে সেই প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র জোরাল। ভাঙচুর, আশ্লেষ, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ফুটে ওঠে চেনা-জানা নানা চরিত্র আর ঘটনা। হাতটা তখন হাতের মতো থাকতে পারে না। আঙুলে লোমশ চামড়ায় মিলিয়ে যেন একটা গাছের গুড়ি এগিয়ে আসে। হাঁটু মুড়ে বসা ভঙ্গিটা আর পদ্মাসন বলে চেনার উপায় থাকে না। মনে আসে বিকলাঙ্গ অষ্টাবক্র মুনির কথা। যেন দর্শকচিত্তে একটা বিরূপতা আনার জন্যই এই চেষ্টা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে আপাত শ্রদ্ধেয়রা যথার্থ শ্রদ্ধেয় নমস্য নয়। কাজ সব শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠেরেখার গুণে, সারল্যের কারণে। এই সরলতাও যে সহজসাধ্য নয়, অনুশীলনসাপেক্ষ, সেটা কেবল যথার্থ রসিকই বোঝে। কি মূল্য দিয়ে শিল্পীকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, প্রকৃত অনুভূতিশীল মনই তার খোঁজ রাখে।

সব রেখাঙ্কন, পোর্ট্রেট, কেমিও তথা বড় ছবি দেখে দর্শককে মানতে হয় যে আরোপিত নয়, বাস্তব এদের মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। সহজিয়া চেহারা। আজকের পারিপার্শ্বিক নানা চরিত্র ও সমস্যাকে স্পষ্টীকরণেরই দরুণ কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ আর একই সঙ্গে শিল্পগুণসম্পন্ন। রেখার কারিগরিতে এসেছে এক ধরণের বিশেষ টেক্সচার বা বুনন। পশ্চাৎপট বহুক্ষেত্রে বর্জিত। আবার প্রয়োজনে সেটা গুরুত্বও পেয়েছে। যেমন, পেছন ফিরে দাঁড়ানো হাততোলা মানুষটা আঁকা নিকষ কালো প্রেক্ষাপটে, যেন তার লোমশ, জান্তব রূপটা তুলে ধরাই শিল্পীর উদ্দেশ্য। মিশ্রপদ্ধতির প্রয়োগে ছবিও হয়েছে অনেক শাণিত।

শিল্পীর চিন্তাপ্রসঙ্গে এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিজের শিল্পভাবনার কথায় সুন্দর উপমাসহযোগে শিল্পীর বক্তব্য : টিউলিপ য়ুরোপেই জন্মায় আর পদ্মফুল পাঁপড়ি মেলে এদেশেই। প্যারী থাকাকালেই ভাবনাটা মাথায় এসেছিল। সেখানে একই উক্তি ভিন্নভাবে, বলা যায়, প্রশ্নাকারে। জিজ্ঞাস্য তাই তার যে য়ুরোপীয় শিল্প ইতিহাস জেনে বা পর্যায়ক্রমে সে পরীক্ষার ভিত্তিতে কাজ করলেই কি আজকের ভারতশিল্প যথার্থ সৃষ্টিশীল বলে গণ্য হবে? আবার মনে আরেক সংশয়। গনেশ, কালী বা প্রাচীন মূর্তি এবং চিহ্নসহযোগে কিছু সৃষ্টি করলেই কি তা সমকালীন হবে? পরিবেশ, মানসিকতা বা সমাজচিন্তার ভিত্তিতে মূল্য নির্ণয় হবে না? তার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তাই যে আজকের ভারতশিল্পে দুইয়েরই সমাহার প্রয়োজন— সমকালীন ভারতও থাকবে এবং শিল্পগত উৎকর্ষও ক্ষুণ্ণ হবে না। আবার আরোপিত ব্যাপার হলেও হবে না। আমাদের শিল্পী মহাকাব্য পুরাণ, কাহিনী বা সেরকম পৌনঃপুনিকতার পথ ছেড়ে , একই সঙ্গে, যা নিজের কাজে অর্থবহ নয়, তেমন বিমূর্ততা বা বিদেশী প্রভাব—এড়িয়ে আপন পথসন্ধানে এগিয়ে গেছেন।

পরিচিত নানা পাত্রের ব্যঞ্জনাময় উপস্থাপনার সঙ্গে অবস্থাবিশেষে যুক্ত হয়েছে এক সুদুর্লভ সরল প্রকাশ। কাহিনী বিন্যাস বহুক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে প্রতীকী—কেবল রসোত্তীর্ণ নয়, কালোত্তীর্ণও বটে। উল্লেখ করা যেতে পারে এপ্রসঙ্গে শিল্পীর '' চাঁদিনীরাতে বাঘ'' ছবিটির। একটি মানুষী শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে। মাথার ওপরে একফালি বাঁকা চাঁদ। ওপাশে ডোরাকাটা একটি বাঘ। সব দেখে শুনে যেন শিকার ধরার অপেক্ষায় রয়েছে। সরলতা—চিন্তায়, রেখাঙ্কনে এবং বর্ণপ্রয়োগেও। সমতল দ্বিমাত্রিক ধরণের কাজ, মাত্রাবিভাগ চোখে পড়ে না। ইচ্ছাকৃত ভাবেই যেন ত্রিমাত্রিকতা পরিহার করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা রেখা বা বক্রতাও লক্ষণীয়। রঙের ব্যবহারও সীমিত। অর্থাৎ, আকাশ নীল করার ব্যস্ততা নেই। গাছপালা বা জঙ্গল বোঝানোও নিস্প্রয়োজন। সব মিলিয়ে রূপকধর্মী বক্তব্য। অর্থাৎ মানুষ নিশ্চিন্তি বা আয়েশ চাইলে কি সেটা পায়, না চাওয়া উচিত, কারণ বিপদ কখন কোথায় ওৎ পেতে আছে কে জানে? অথবা বলা যায় যে দৃশ্যমানের বাইরের অদৃশ্য শত্রু বা আঘাতের জন্যও প্রস্তুতি প্রয়োজন। ব্যাখ্যা যা-ই হোক্ এ-ছবি শুধু চোখ নয়, মন বা হৃদয় দিয়েও দেখতে হয়। অন্তত ছবির দাবি সেই রকম? সেখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব। অসম্ভব নয় যে আঁরি রুশোর একটি সুপরিচিত ছবি এপ্রসঙ্গে স্মরণে আসবে। সেখানে কৃষ্ণকায় এক নিদ্রিত মানুষ। পাশে কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ানো এক সিংহ। আফ্রিকা—প্রায় অজানা মানুষ ও দেশ—অথবা এক অদ্ভুত রহস্যময়তা তাতে বিধৃত। সেসঙ্গে রঙেরও একটা মুখ্য ভূমিকা। চিন্তা বা বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য সত্ত্বেও মানতে হয়, ভিন্নতা যথেষ্টই রয়েছে। পার্থক্য প্রয়োগে, উপস্থাপনে, সর্বোপরি আলোচ্য পরবর্তী কাজের সহজ সরলতায়। মননেও ভিন্নতর। হয়ত বা পরিচিত বাতাবরণেও।

৪

যোগেন চৌধুরীর কলাযাত্রা নানাভাবেই বিশিষ্টতার দাবি রাখে। নতুন প্রজন্মের তিনি এক উল্লেখনীয় প্রতিভূ, সে বিষয়ে তর্ক চলে না। দেশভাগের বিপর্যয় নিছক এক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, জীবনেরও বিশেষ উপলব্ধি। ছবি তার জীবন ছাড়িয়ে বা বাইরের নয়, নিতান্ত অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতারও ব্যাপার। কলম-তুলিতে সে অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। আরও বড় কথা, তাতে তিনি ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। সেই অর্থে বোধহয় সব্যসাচীও। কিন্তু চোখের সামনে ভাঙচুর দেখাই কেবল নয়, কবিতা-সাহিত্যের কাছাকাছি হওয়াটাও বিশেষ অর্থবহ। সংবেদনশীল এক মন তাতে তৈরী হয়েছে। চরিত্র, ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, স্বার্থ, কালিমা, গ্লানি আবার প্রেম-ভালবাসাও ধরা পড়েছে সেই মনের মুকুরে। সেই সঙ্গে শিক্ষিত মার্জিত রুচির অনুশীলন বা ফরাসীয়ানার অদৃশ্য স্পর্শও অমিল নয়— কাজে চিন্তায়। পরিণামে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে এক পর্ব থেকে আরেক পর্বে তাঁর সহজ উত্তরণ ঘটেছে। পরিশীলিত চিন্তা এবং কুশলী প্রয়োগের দুরূহ যোগাযোগে, কাজের বড় অংশ সহজেই রয়েছে রসোত্তীর্ণ। শৈল্পিক দক্ষতা অনেকেরই হয়ত থাকে, কিন্তু ভাবনার ঐশ্বর্যে দীন থাকায়, বহু শিল্পীর প্রয়াসই শেষ অবধি অসার্থকতার মরুতে হারিয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত সেরকম দুর্ঘটনার কারণ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। স্তর থেকে স্তরান্তরে চিন্তার ক্রমপরিণতি বা প্রকাশে শিল্পকৃতি অভিষিক্ত হয়েছে নতুন মর্যাদায়।

সংক্ষেপে, প্রয়োগ তথা চিন্তার ভিন্নতা এবং বলিষ্ঠতায় শিল্পী বিশিষ্ট। তাঁর কলা যাত্রার পরবর্তী ধাপগুলোও তাই সাগ্রহে লক্ষণীয়।

'দেশ'
বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৩